প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ : ফিরে দেখা

সাইফুল্লা

আমরা বাঙালিরা আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসকে ঘিরে বেশ কিছু গল্প তৈরি করেছি। এমনিতে গল্প যেমন হয় এই গল্পগুলিও তেমনি। বাস্তবের উপর কল্পনার রঙ মেশান। বাস্তবকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে নিলে গল্প উপভোগ্য হয়। এমন গল্পের রস গ্রহণ করতে আমাদের কারও কোনো আপত্তি নেই। তবে সে অবশ্যই শিল্প সাহিত্যের অঙ্গনে। সাহিত্যের ইতিহাসের এলাকায় নয়। সাহিত্যের ইতিহাস বস্তুনিষ্ঠ বিষয়। এখানে কল্পনার বা ভাববিলাসের কোনো স্থান নেই। দেশ কাল সমাজের প্রেক্ষিতে একজন সাহিত্যিক ও তাঁর সৃষ্টিকে বিশ্লেষণ করা সাহিত্যের ইতিহাসকারের কাজ। এ কাজের দায়দায়িত্ব খুব বেশি। ইতিহাসে থাকে বড় বড় সব ঘটনার বর্ণনা। ওইসব ঘটনার বাইরে থেকে যায় যেসব ছোটো ছেটো বিষয়, যা দেশের আমজনতাকে ঘিরে নিত্য নতুন রূপে ঘটে চলে তার ইতিহাস রচিত হয় একজন সাহিত্যিকের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। সাহিত্যের ইতিহাসকার এক্ষেত্রে ওই সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করে এর ভিতরের ইতিহাসকে আর স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেন। এমন তাৎপর্যপূর্ণ যে ইতিহাস তাতে যদি বড় ধরনের কোনো বিচ্যুতি থাকে তবে তার ফল মারাত্মক হয়। জাতীয় ইতিহাসের পাঠ যথাযথ হয় না। উত্তরসূরিরা এই ভুল পাঠকে পাথেয় করে পথ হাঁটেন এবং বিপথগামী হন। বিপর্যস্ত হয় জাতীয় সংস্কৃতি। প্রচলিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মূলক রচনাগুলিতে থেকে গেছে এমনই কিছু বিচ্যুতি, যা জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিকে দিনে দিনে দুর্বল করেছে এবং আজও করছে। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অন্ধকার যুগের গল্প এইসব বিচ্যুতির মধ্যে অন্যতম।

শ্রীসুকুমার সেন, শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোপাল হালদার থেকে শুরু করে ক্ষেত্র গুপ্ত পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের অনেক প্রখ্যাত ইতিহাসকার ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত করেছেন, এই কালপর্বটিকে তাঁরা অন্ধকার যুগ হিসাবে বর্ণনা করতে আগ্রহী হয়েছেন। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত কোনো সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে না। শ্রদ্ধেয় ইতিহাসকাররা অনুমান করেছেন দ্বাদশ শতাব্দীর সূচনায় বাংলাদেশে যে তুর্কি আক্রমণ হয় তার প্রভাবে আমাদের জাতীয় জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, স্তব্ধ হয়ে যায় সাহিত্য চর্চার ধারা, সূত্রপাত হয় এক তামস যুগের :

> তুর্কীরা শুধু দেশ জয় করেই সন্তুষ্ট হয়নি, তারা বাংলার জীবনে গুরুতর আঘাত হেনেছিল। তুর্কী মুসলমানরা হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধ মঠবিহারের মধ্যে একটি ব্যাপক ধ্বংস অভিযান চালিয়েছিল। এই হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধ মঠই ছিল সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র এবং এইকারণেই বোধ হয় তুর্কী বিজয়ের প্রায় দুইশত বছর ধরে বাংলা সাহিত্য রচনার আর কোনও নিদর্শন মেলে না। মঠ-মন্দিরে রক্ষিত গ্রন্থাবলী বিনষ্ট হয়েছিল। এবং এই অন্তর্বর্তীকালে সমস্ত বাংলা রচনাও এই বিনাশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। সেই জন্য চর্যাপদের পর বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (১৩৫০) পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে একটি বিরাট শূন্যতার যুগ। (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা)।
>
> শারীরিক বল, সমরকুশলতা ও বীভৎস হিংস্রতার দ্বারা মুসলমানরা অমানুষিক বর্বরতার মাধ্যমে বঙ্গসংস্কৃতির ক্ষেত্রে তামস যুগের সৃষ্টি করে।... 'বর্বর শক্তির নির্মম আঘাতে বাঙালি চৈতন্য' হারিয়েছিল।... তুর্কি রাজত্বের আশি বছরের মধ্যে বাংলার হিন্দু সমাজে প্রাণহীন অখণ্ড জড়তা ও নাম-পরিচয়হীন সন্ত্রাস বিরাজ করিতেছিল।... কারণ সেমীয় জাতির মজ্জাগত জাতিদ্বেষণাও ধর্মীয় অনুদারতা।...১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বাংলাদেশ মুসলমান শাসনকর্তা, সেনাবাহিনী ও পীর ফকির গাজীর উৎপাতে উৎসন্নে যাইতে বসিয়াছিল। (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত)।
>
> তুর্কী আক্রমণের ফলে বাঙালির

> বিদ্যা ও সাহিত্যচর্চার মূলে কুঠারাঘাত পড়িল। প্রায় আড়াই শত বৎসরের মতো দেশ সকল দিকেই পিছাইয়া পড়িল। দেশে শান্তি নাই, সুতরাং সাহিত্যচর্চা তো হইতেই পারে না। প্রধানত এই কারণেই ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ এই দুই শতাব্দীতে রচিত কোনো বাঙ্গালা সাহিত্য পাওয়া যায় নাই। (সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস)

এমন সব অভিমতকে ঘিরে বিতর্ক তৈরি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বিতর্ক তৈরি হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, তুর্কি আক্রমণ অন্ধকার যুগের কারণ, না কি একে বর্ণনা করা হবে এক আলোকিত অধ্যায়ের শুভ সূচনা হিসাবে? বিষয়টি পুনর্বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। অন্ধকারের ধারণা সত্য হয় আলোর সাপেক্ষে। আলো না থাকলে আলাদা করে অন্ধকারের কোনো অস্তিত্ব নেই। তখন সবটাই অন্ধকার। প্রশ্ন ওঠে, তুর্কি আক্রমণের আগে বাংলাসাহিত্যে কবে আলোর যুগ এসেছিল যে তার সাপেক্ষে তুর্কি আক্রমণ পরবর্তী অধ্যায়কে অন্ধকার যুগ বলতে হবে। প্রাক্ তুর্কি আক্রমণ পর্বের বাংলা সাহিত্য বলতে রয়েছে চর্যাপদ। চর্যাগীতিকোষ বা চর্যাচর্যবিনিশ্চয়। বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যদের সাধনতত্ত্ব বিষয়ক রচনা। বিশুদ্ধ সাহিত্য নয়। তাছাড়া চর্যাপদ কেবলমাত্র বাঙালি ও বাংলা সাহিত্যের সম্পত্তি নয়। অসমিয়া, উড়িয়া, মৈথিলি, হিন্দি প্রভৃতি অপরাপর নব্য ভারতীয় আর্যভাষা ও সাহিত্যের বীজও অঙ্কুরিত রয়েছে এখানে। এইসব ভাষাভাষীরা চর্যাপদকে তাদের ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন বলে দাবি করেন। এ দাবি অযৌক্তিক নয়। ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে চর্যাপদে বাংলা ছাড়াও আরও কিছু কিছু নব্য ভারতীয় আর্যভাষার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ ভাষার জঠর থেকে সদ্যজাত একটি ভাষা যার আঞ্চলিক রূপগুলি তখনো স্পষ্ট হয়নি, প্রাজ্ঞজনেরা যে ভাষাকে বলেছেন প্রত্ন নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা, চর্যাপদগুলি লেখা হয়েছে সেই ভাষায়। তাই যদি হয় তবে চর্যাপদকে বিশুদ্ধ বাংলা সাহিত্য বলা যায় না। আর চর্যাপদকেই যদি বাদ দিতে হয় তবে তুর্কি আক্রমণ পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। অর্থাৎ প্রাক্ তুর্কি আক্রমণ পর্বে সেইঅর্থে বাংলাসাহিত্যের ঠিকঠাক যাত্রাই শুরু হয়নি। যে সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়নি, তার আলোর যুগের অস্তিত্ব ধরে নিয়ে অন্ধকার যুগের কল্পনা বাতুলতা নয় কি। পবিত্র সরকার তাঁর ভাষাসরিৎসাগর এ তেমনি অভিমত পোষণ করেছেন।

চর্যাপদ নিয়ে বিতর্ক না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। ধরেই নেওয়া যাক এটা বিশুদ্ধ বাংলা সাহিত্য। তাই যদি হয় তাতেও কি অন্ধকার যুগের কল্পনা ভিত্তি পায়। এক চর্যাপদের সূত্রে বাংলা সাহিত্যে আলোর যুগের সূচনা হয়েছিল একথা বলা যায় না। আলোর যুগের সূত্রপাত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এমনও নয়। তখন সেন রাজাদের কাল। উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন রাজারা বাঙালির নিজস্ব সভ্যতা সংস্কৃতি সম্পর্কে অস্বাভাবিক রকমের বিরূপ ছিলেন। বাংলা ভাষার প্রতি কোনোরকম শ্রদ্ধা তাঁরা পোষণ করতেন না। রাজসভায় বাংলা ভাষার প্রবেশাধিকার ছিল না। কমবেশি বিতর্ক থাকলেও ধরে নেওয়া যায় জয়দেব বাঙালি। বাঙালি কবি জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় গীতগোবিন্দ কাব্য রচনা করেছেন। বিষয়টি ভেবে দেখার। রাজসভায় বাংলা ভাষা আদৃত না হওয়ার জন্যই জয়দেবের মতো কবিরা বাধ্য হয়েছিলেন সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় নিতে। কোনো কোনো পণ্ডিতজন মনে করেছেন জয়দেব প্রথমে দেশীয় ভাষায় তাঁর গীতগোবিন্দ রচনা করেছিলেন, পরে তিনি এটি সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। এমন হলে সেন আমলে বাংলা ভাষার দুরবস্থার কথা আরও প্রকট রূপে প্রতিপন্ন হয়। রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা বঞ্চিত বাংলা ভাষা তখন মাথা ঠুকে মরছিল খিড়কির দুয়ার পথে। সমাজে যারা ঘৃণ্য, যাদের অবস্থান সমাজের মূল স্রোত থেকে দূরে কোনো নির্জনে—'নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ' তারাই ছিল সেদিন বাংলা ভাষার প্রধান আশ্রয় দাতা। এমন অন্ত্যজ শ্রেণির দ্বারা উচ্চমার্গের কোনো লেখ্য সাহিত্য রচনা স্বাভাবিক নয়। সেদিনের বাঙালি ও বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

প্রাক্ তুর্কি আক্রমণ পর্বে বাংলাসাহিত্যে আলোর যুগ আসেনি, আলোর যুগ তৈরি হওয়ার ক্ষীণ সম্ভাবনাও দেখা যায়নি। কাজেই তুর্কি আক্রমণের কারণ দেখিয়ে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীকে অন্ধকারযুগ বলা চলে না। তেমন কিছু বলা হলে তা বাতুলতারই নামান্তর হয়। যে কোনো বড় মাপের রাজনৈতিক পালাবদলের সময় জাতীয় জীবনে একটা অস্থিরতা দেখা দেয়। এই অস্থিরতার কারণে কবি সাহিত্যিকদের কাব্যচর্চা বন্ধ হয়ে যায় ইতিহাসে এমন সাক্ষ্য বিশেষ নেই। বরং এর বিপরীত উদাহরণের আধিক্য রয়েছে। আমাদের বাংলা সাহিত্যের কথাই ধরা যাক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবাবী আমলের শেষ দিকে বঙ্গদেশে ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল, মূল্যবোধের চূড়ান্ত অবক্ষয় শুরু হয়েছিল, আত্মবিশ্বাস ধর্মবিশ্বাস এসবের ভিত্তি গিয়েছিল ধ্বসে। এমন অস্থিরতার দিনেও বাংলা সাহিত্যের গতিধারা স্তব্ধ হয়নি বরং নতুন রূপে নতুন মাত্রায় উদ্ভাসিত হয়েছিল। শাক্তপদাবলীর মতো বিস্ময়কর ভক্তিরসাত্মক কাব্যের ধারা এইসময়ই প্রবাহিত হয়েছিল আমাদের সাহিত্যাঙ্গনকে প্লাবিত করে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, গরীবুল্লাহর জঙ্গনামার মতো অসামান্য কাব্যসমূহ এই যুগেরই ফসল। অষ্টাদশ শতাব্দীর অস্থিরতার সঙ্গে দ্বাদশ শতাব্দীর তুর্কি আক্রমণ জনিত পরিস্থিতির তুলনা হয় না। জাতীয়জীবনে সেদিন সর্বাত্মক কোনো সংকট দেখা দেয়নি। সেদিন আত্মিক সংকটের মধ্যে যদি কোনো শ্রেণি পড়েও থাকেন সে একাত্মভাবে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমাজ। কিন্তু তারা সমাজের কতজন ছিলেন। তাছাড়া তারা তো কখনো বাংলা ভাষার চর্চা করেননি, বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে পা রাখেননি। এই অবস্থায় তাদেরকে সামনে রেখে বাংলা সাহিত্য বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক। উচ্চবর্ণের বাইরে সেদিন যারা সাধারণ মানুষ ছিলেন তাদের জীবনে আলাদা করে কোনো সংকট তৈরি হয়নি, তারা বরং কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই অবস্থায় তাদের দিক থেকে সাহিত্যচর্চা বিষয়ে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি হওয়ার প্রশ্ন আসে না। শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে কোনো ব্যক্তি যখন একটু স্বস্তি পান তখন তিনি শুধু প্রাণে বাঁচেন না, আত্মিক ভাবেও বাঁচার চেষ্টা করেন, শিল্প-সাহিত্যের চর্চায় উদ্যোগী হন। বাঙালি জাতি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হওয়ার সঙ্গত কোনো কারণ নেই। সেদিনের শোষিত

নির্যাতিত হিন্দু-বৌদ্ধ সমাজের যে অংশ ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন তারাই পরে ঘটনা পরম্পরায় প্রস্তুত করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের নতুন সৌধ, রোমন্টিক প্রণয় উপাখ্যান, যুদ্ধকাব্য, ইসলামি সাহিত্য প্রভৃতি। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবিদের আসামান্য ভূমিকা রয়েছে। একটা সময় অমুসলমান কবিদের সাপেক্ষে প্রায় তুল্যমূল্য অবস্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন তাঁরা। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু করে উনিশ শতকের প্রথম দুই দশক পর্যন্ত তাঁরাই ছিলেন সাহিত্যের অঙ্গনে একচ্ছত্র অধিপতি। পুথিসাহিত্যের ঝরনা ধারায় সেদিন স্নাত হয়েছিল বঙ্গদেশ, বিশেষত বাঙালি মুসলমান সমাজ। অন্ধকার থেকে আলোর অঙ্গনে এসে প্রতিষ্ঠিত হতে কিছু সময় লাগা স্বাভাবিক। মুসলমান কবিদের ক্ষেত্রেও এই সময় লেগেছিল। তখন সেন আমলের রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের অবসান হয়েছিল বটে কিন্তু অত্যাচারিত সমাজ রাতারাতি অত্যাচারের দুঃসহ স্মৃতি থেকে মুক্ত হতে পারেননি, সময় লেগেছিল। আত্মবিশ্বাসের মেঘ ঘনীভূত হয়েছিল ধীরে ধীরে। ইউসুফ জোলেখা কাব্যের সূত্রে পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হন কবি শাহ মুহম্মদ সগীর। অতঃপর শুরু হয় প্রবল বর্ষণ। শত শত মুসলমান কবির কাব্যবীণার স্নিগ্ধ স্পর্শে স্নাত হয় প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য। আমরা তুর্কি আক্রমণের ফলাফলের কথা পর্যালোচনা করতে গিয়ে সমকালের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবিদের উজ্জ্বল উপস্থিতির কথা মোটের উপর বিস্মৃত হই। ফলত ভ্রান্তির বহর বাড়ে।

তুর্কি আক্রমণের ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাঙালির সাহিত্য চর্চা স্তব্ধ হয়ে গেছিল এমন সিদ্ধান্তের পক্ষে কোনো প্রামাণ্য দলিল নেই, উল্টে বেশ কিছু তথ্য প্রমাণ রয়েছে যা থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রতিপন্ন হয় দশম-দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের চর্চা অব্যাহত ছিল। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না, এর দ্বারা এটা প্রমাণ হয় না যে এই সময় বাঙালি কোনো সাহিত্যচর্চা করেননি। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজ যে তাদের সাহিত্য চর্চার ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন তার প্রমাণ চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রথম শ্রেণির রচনা। চরিত্র চিত্রণে, ভাষা ব্যবহারে, গঠনরীতিতে এ রচনা শুধু প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের সাপেক্ষে নয় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নিরিখেও অসামান্য। চর্যাপদ সেদিক থেকে সাহিত্যের সম্ভাবনা যুক্ত রচনা মাত্র। সাহিত্য একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারা। এখানে লাফিয়ে পথ চলা যায় না। চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান কবি বড়ু চণ্ডীদাস তা এক লম্ফে পার হয়েছেন এমন মনে করা অযৌক্তিক। সাহিত্য চর্চার ক্রমবহমান ধারা পথের ঘনিষ্ঠ অনুসরণ ভিন্ন কোনোভাবেই চর্যাপদ থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এ পৌঁছান সম্ভব নয়।

শিল্প সাহিত্যের অঙ্গনে স্রষ্টা শেষকথা বলেন না। সময়,অন্য অর্থে যুগগত চাওয়া পাওয়াও এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে। মধুসূদন যদি উনিশ শতকের নবচেতনার আলোয় আলোকিত না হতেন তবে অতি বড় প্রতিভাধর হওয়া সত্ত্বেও তিনি মহাকাব্য রচনা করতে পারতেন না, অমিত্রাক্ষর ছন্দের বাস্তব রূপায়ণেও অসমর্থ হতেন। সাহিত্য যতটা স্রষ্টার ঠিক ততটাই সময়ের। ব্যক্তিগত দক্ষতায় চরিত্রচিত্রণ, রচনাশৈলী প্রভৃতি বিষয়ে একজন সাহিত্যিক তাঁর সময়কে ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা অগ্রসর হতে পারেন। কিন্তু ভাষা,ছন্দ এসবের ক্ষেত্রে তিনি ঠেকে যেতে বাধ্য। ভাষা সময়ের সৃষ্টি। ছন্দও তাই। যে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনা করা হয়েছে তা বড়ু কবির একার সৃষ্টি নয়। চর্যার পাদাকুলক ছন্দ থেকে একক প্রচেষ্টায় পয়ার বা ত্রিপদীতে পৌঁছান যায় না। চর্যাপদের ভাষা প্রত্ন বাংলা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অনুপম কাব্য ভাষায় রচিত— 'কে না বাঁশি বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।/কে না বাঁশি বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।।/আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।/বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রন্ধন।।' আবারও বলতে হয়, একদিনে একক প্রচেষ্টায় এতখানি ভাষা-পথ অতিক্রম করা যায় না। আমরা মনে করি বহু কবি বহুদিনের সাধনায় এই পথটুকু অতিক্রম করেছিলেন। ওইসব কবি ও তাঁদের সৃষ্টি কালের গর্ভ হারিয়ে গেছে হয়তো। বাঙালির যা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবোধ তাতে এমন বিনষ্টি অস্বাভাবিক নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন উদ্ধার হয়েছে গোয়াল ঘরের মাচা থেকে। এটা যে উইপোকায় খেয়ে নষ্ট করে ফেলেনি সেটাই আশ্চর্যের। যদি ঘটনাচক্রে চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন না আবিষ্কৃত হত তবে আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের সূত্রপাত হত কৃত্তিবাসের রামায়ণ অথবা চণ্ডীদাসের পদাবলী সহযোগে। সেক্ষেত্রে অন্ধকার যুগের তত্ত্বকথা নিয়ে আমরা আরও মাতামাতি করতাম না কী। দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর রচনা চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয়েছে এই বিংশ শতাব্দীতে। কে নিশ্চিত করে বলবেন, ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর কোনো রচনা একবিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হবে না। যদি ঘটনাচক্রে সত্যিই তেমন কিছু হয় তবে কোথায় দাঁড়াবে অন্ধকার যুগের তত্ত্বকথা।

দুই শত বছরের ঔপনিবেশিক শাসনকালে ইংরেজ রাজন্যবর্গ আমাদের বাহ্য সম্পদ যা কেড়ে নেওয়ার তা তো নিয়েছেনই, সবচেয়ে বেশি করে দেউলিয়া করে দিয়েছেন মানসিক ক্ষেত্রে। আমাদের সামর্থ্য ও সজীবতা, মননের গভীরতা এসব নষ্ট হয়েছে বিশেষভাবে। ব্রিটিশদের দেখানো পথের বাইরে গিয়ে আমরা নতুন করে কিছু দেখতে পাই না, ভাবতে পারি না। আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাস তাই ইংরেজি ভাবনার জারক রসে জারিত, কোনো মৌলিক চিন্তনের ফসল নয়। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থাকে সুদূরপ্রসারী ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের ইতিহাসকে নতুন রূপে রচনা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। আমরা তাদের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছি প্রথমাবধি। তাই অন্ধকার যুগের ভাবনা ভাবতে প্রাণিত হয়েছি। অন্ধকার যুগের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হলে সেদিনের মুসলমান শাসকদের খলনায়ক হিসাবে প্রতিপন্ন করা যায় এবং তার দায় চাপিয়ে দেওয়া চলে আজকের মুসলমান সমাজের উপর। সমীকরণটা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

প্রশ্ন হল, বৈদেশিক আক্রমণ, শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন কোন দেশে না হয়েছে। পৃথিবীর সর্বত্র কমবেশি এই ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তার জন্য কবে কোথায় সাহিত্যচর্চার ধারা সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে গেছে। যে মুসলমান শাসকদের উপর দায় চাপিয়ে দিয়ে এতকথা বলা হচ্ছে সেই মুসলমান শাসকরা তো শুধু বঙ্গদেশে তাদের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেননি, প্রায় অর্ধেক পৃথিবীতে তারা কর্তৃত্ব বিস্তার করেছিলেন। যেসব দেশ তারা শাসন করেছিলেন তার

কোথাও সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা স্তব্ধ হয়ে যায়নি। শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই এটা হল। অন্যসব দেশের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া যাক। আসা যাক আমাদের দেশ ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে। বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনায়। এর অন্তত তিনশত বছর আগে উত্তর ভারতে মুসলিম শাসন কায়েম হয়েছিল। সেখানে কী কোনো অন্ধকার যুগের সূচনা হয়েছে। না, হয়নি। বরং বিজাতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির সংস্পর্শে ঋদ্ধ হয়েছে স্থানীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি। সমকালীন হিন্দি-আওয়াধি ভাষার সাহিত্যকৃতি তার প্রমাণ। হিন্দি সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য কবি আমীর খসরু। শুধু হিন্দি সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, সমকালীন অপরাপর অনেক ভারতীয় সাহিত্যেও রয়েছে মুসলিম কবিদের দৃপ্ত পদচারণা। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, তুলনামূলক বিচারে মধ্যযুগের ভারতবর্ষে একটা সময়ে সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চায় যে কিছুটা ভাটার টান শুরু হয়েছিল তার কারণ রাজনৈতিক নয়, কারণটা আর্থ-সামাজিক ও সমাজ-ভাষিক। সংস্কৃত সাহিত্য বিপুল ঐশ্বর্য মণ্ডিত। পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্যের ভাণ্ডারও কম ছিল না। কালের নিয়মে তখন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এর নিজস্ব ছন্দ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। প্রাকৃত, পালি প্রভৃতিরও তথৈবচ অবস্থা। এদিকে নব্যভারতীয় আর্যভাষা সমূহের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। এই অবস্থায় সংস্কৃতির, বিশেষত সাহিত্য ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। বাংলা সাহিত্যেও এর প্রভাব কমবেশি পড়ে থাকবে। তার অতিরিক্ত কোনো রঙ এখানে লাগেনি। এদিকে আমাদের প্রাজ্ঞজনেরা বিষয়টিকে যেনতেন ভাবে সাম্প্রদায়িকতার রঙে রঞ্জিত করতে বদ্ধপরিকর। তাঁদের এই উগ্রভাবনা অবশ্যই সুস্থ চেতনার পরিচয় নয়। ভারতেতিহাসে রয়েছে বেশ কিছু ঘোরতর অন্ধকার অধ্যায়। আজ আমরা যে ভারতীয় জনসমাজকে নিতান্ত অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখি সেই সাঁওতাল, হো, মুণ্ডা প্রভৃতি একদিন এই ভারতভূমির দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিল। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে তারা ছিল অসামান্য অগ্রসর অবস্থানে। হরপ্পা-মহেঞ্জদড় সভ্যতা তাদেরই সৃষ্টি। এমন এক সুসভ্য জাতি আর্য-অভিঘাতের প্রাবল্যে ও ভয়াবহতায় ক্রম ক্রমে সভ্যতা-সংস্কৃতির অঙ্গন থেকে নির্বাসিত হয়ে আজ বন্যপ্রায় জাতিতে পরিণত হয়েছে। তাদের সাহিত্যের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। তারপরেও ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাস রচনা করতে বসে আলোচ্য ক্ষেত্রে আমরা মৌনব্রত অবলম্বন করি; আর মাত্র দুইশত বছরের লিখিত সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে না দেখে একটা সময়কে অন্ধকার যুগ হিসাবে বর্ণনা করতে উৎসাহ দেখাচ্ছি। শোভনতার মুখরক্ষা হচ্ছে না কিছুতেই।

মনে রাখা দরকার সেদিনের সামাজিক পরিকাঠামো আজকের দিনের মতো ছিল না। দিল্লির বা কলকাতার কোনো খবর একমুহূর্তে প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছে যেত না। রাজধানীতে রাজার পরিবর্তন হলে গ্রামের মানুষের কাছে তার সংবাদ পৌঁছাত বহু বিলম্বে অথবা পৌঁছাতই না। তাছাড়া সেদিনের রাজনৈতিক পরিকাঠামোয় রাজার সঙ্গে প্রজার সম্পর্কের রূপটি ঠিক কেমন ছিল তাও ভেবে দেখার। রাজার সঙ্গে প্রজার প্রত্যক্ষ কোনো যোগাযোগ ছিল না। স্থানীয় রাজস্ব সংগ্রাহকদের সঙ্গে প্রজাদের যা কিছু মোকাবিলা হত। রাজার প্রাপ্য রাজস্ব এবং তার অতিরিক্ত কিছু প্রদান করতে পারলে প্রজা একরকম নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। গৌড়ের বা মুর্শিদাবাদের খবর নিয়ে তাকে আলাদা করে মাথাব্যথা করতে হত না। এই অবস্থায় রাজনৈতিক পালাবদলের জন্য গ্রামে গঞ্জে কবিরা কলম বন্ধ করে দিয়ে বসে থাকবেন এটা হয় না। কথা উঠতে পারে, সেযুগে সাহিত্যচর্চার আদর্শ কেন্দ্র ছিল রাজসভা এবং রাজন্যতন্ত্রের দ্বারা পরিপুষ্ট ভূস্বামীদের দরবার প্রভৃতি। রাজনৈতিক পালাবদলের অভিঘাতে তাই সাহিত্যচর্চায় ভাটার টান শুরু হওয়া স্বাভাবিক। তত্ত্বগতভাবে কথাটা হয়তো ভুল নয়, কিন্তু তারপরেও কথা থেকে যায়। আরও প্রশ্ন ওঠে, প্রাক্ তুর্কি আক্রমণ পর্বে বাংলার কোন রাজ দরবার অথবা ভূস্বামীর দরবার থেকে দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছিল। এমন কী পাল আমলেও প্রত্যক্ষভাবে রাজতন্ত্র কর্তৃক দেশীয় ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করার তেমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই। এ বিষয়ে প্রথম ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে মুসলমান রাজন্যবর্গের পক্ষ থেকে। কৃত্তিবাস ওঝা, মালাধর বসু, শ্রীকর নন্দী সহ সে যুগের ছোটো বড় বিভিন্ন কবি রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। এই পৃষ্ঠপোষকতার ঘটনা না ঘটলে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ নিশ্চিতভাবে ব্যাহত হত। তুর্কি আক্রমণ সেদিক থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল— 'আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ই বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।'... (দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

প্রসঙ্গত আরও কয়েকটি বিষয় বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। দ্বাদশ শতাব্দীর সূচনায় ইখতিয়ারউদ্দিনের নেতৃত্বে বঙ্গদেশ মুসলমানদের দ্বারা অধিকৃৎ হয়েছিল এটা অর্ধসত্য। ইখতিয়ারউদ্দিন বঙ্গদেশের অংশ বিশেষের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন মাত্র। তাঁর প্রভাব সীমায়িত ছিল গঙ্গার পশ্চিম তীর বরাবর। পূর্ববঙ্গে তিনি সেভাবে কর্তৃত্ব কায়েম করতে পারেননি। লক্ষ্মণ সেন পদ্মা পেরিয়ে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান ঠিকই, কিন্তু পালিয়ে গিয়ে তিনি আত্মগোপন করে ছিলেন না, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যাপন করেছিলেন রাজন্যোচিত সত্তাসহ। তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর উত্তরসূরিরা পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল শাসন করেন। আসামের কাছাড় অঞ্চল সহ বাঙালি অধ্যুষিত যে বিরাট পূর্ববঙ্গ তা মুসলমানদের অধিকারে আসে গৌড় বিজয়ের অনেক পরে, চতুর্দশ শতাব্দী নাগাদ। সে অধিকারও স্থায়ী হয়নি। ষোড়শ শতকে সম্রাট আকবর প্রথম এই অঞ্চলে স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করেন। আকবর দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর বঙ্গদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন বিখ্যাত সেনানায়ক মানসিংহ। মানসিংহের প্রবল প্রতাপের কাছে শেষপর্যন্ত মাথা নত করতে বাধ্য হন পূর্ববঙ্গের স্থানীয় রাজন্যপুরুষরা। তুর্কি বিজয়ের পরে আরও কয়েক শত বছর তাঁরা নিজ নিজ এলাকায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাই যদি হয়, তবে তুর্কি আক্রমণের ফলে বাংলা সাহিত্যের গতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল এমন অভিমত ভিত্তি পায় না। তাছাড়া রাজনৈতিক অভিঘাতের কারণে গৌড় কেন্দ্রিক সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চায় ছেদ পড়তে পারে। পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সাহিত্যচর্চা না হওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। বস্তুত এইসময় পশ্চিমবঙ্গের মতো পূর্ববঙ্গেও সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চায় ভাটা

পড়েছিল আমাদের পূর্ব উল্লেখিত আর্থ-সামাজিক ও সমাজ-ভাষিক কারণে।

একটা কথা খুব জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করা হয়। তুর্কি আক্রমণের ফলে এমনই অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল যে সমকালের কবি সাহিত্যিকরা শুধু কলমই বন্ধ করে দেননি, তাদের লোটা কম্বল নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন দূর দেশে। লোটা কম্বল নিয়ে যে কেউ কেউ পালিয়ে গিয়েছিলেন তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই। প্রশ্ন হল, এই পালিয়ে যাওয়ার প্রকৃত কারণ কী। চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয়েছে নেপালের রাজদরবার থেকে। বোঝা যায় চর্যাকাররা একটা সময় বাংলা ছেড়ে নেপালে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁদের এই দেশত্যাগের কারণ তুর্কি আক্রমণ নয়। এর মূলে রয়েছে সেন রাজত্বের অভিঘাত। পাল রাজাদের আচরণীয় ধর্ম সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। মনে করা হয় তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। যদি এই ধারণা ঠিক নাও হয় তবু সন্দেহ থাকে না যে পাল আমলে বঙ্গদেশে কমবেশি বৌদ্ধ আধিপত্য ছিল। একটা সময় প্রতিবাদী ধর্মান্দোলনের দ্বারা প্লাবিত হয়েছিল গোটা ভারতবর্ষ। বাংলাদেশের বেলাভূমিতে এর ঢেউ আছড়ে পড়েছিল আরও বেশি করে। এক বিরাট অংশের বাঙালি সেদিন বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং এদের অধিকাংশই ছিলেন অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ। অন্ত্যজ শ্রেণির এই মানুষগুলিকেই এতকাল ধরে বংশ পরম্পরায় শোষণ করে আসছিলেন অভিজাত ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়। প্রতিবাদী ধর্মান্দোলনের প্রেক্ষিতে তাদের কায়েমী স্বার্থ বিঘ্নিত হয়। শাস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষগুলিকে কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছিল না। রাজদরবার থেকে ধর্মান্তরিত সমাজকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিল। প্রবল ক্ষোভ আর দ্বেষকে নীরবে ধারণ করে অপেক্ষা করছিলেন অভিজাত শ্রেণি, সুযোগের প্রত্যাশায়। সেন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সূত্রে সেই সুযোগ তৈরি হল। প্রবল ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন রাজারা প্রথমাবধি খড়্গ হস্ত হলেন বৌদ্ধ সমাজের প্রতি। অভ্যন্তরীণ বিরোধে বিরোধে জর্জরিত বৌদ্ধসমাজের তখন এমনিতেই খুব খারাপ অবস্থা। তার উপর এই রাজনৈতিক প্রত্যাঘাত। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে দিশাহারা হয়ে পড়ে গোটা সমাজ জীবন—'ইহা ছাড়া হিন্দুরা বৌদ্ধ-কীর্তি একেবারে লোপ করিবার জন্য যেখানে তাঁহাদের প্রাচীন কীর্তি ছিল তাহা মহাভারতোক্ত পঞ্চপাণ্ডব অথবা আর কোন হিন্দু রাজ-রাজড়ার সম্পর্কিত এইরূপ পরিকল্পনার দ্বারা বৌদ্ধাধিকারের চিহ্নমাত্র লোপ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন।' (দীনেশচন্দ্র সেন,বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য) ধর্মের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ছিল শুধুই আনুষ্ঠানিক, বেঁচে থাকার উপকরণ হিসাবে যারা ধর্মকে ধারণ করার পক্ষপাতী ছিলেন তারা দ্বিধাহীন হয়ে পড়লেন যথাসময়ে। রাতারাতি নতুন করে বৌদ্ধ থেকে হিন্দু ধর্মে অন্তর্ভুক্ত হলেন তারা। যারা সেটা করতে পারলেন না, যারা ধর্মকে স্থান দিতেন জীবনের উপরে তারাই প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে পালিয়ে গেলেন নেপালে। নেপালে তখনও বৌদ্ধ সংস্কৃতির এমন বিপন্ন অবস্থা হয়নি। বলাবাহুল্য এই শ্রেণির লোকেরা সংখ্যায় বেশি ছিলেন না। ফলত দেশত্যাগী ব্যক্তির সংখ্যাও কম ছিল। যারা দেশত্যাগ করেননি, আবার ধর্মও ত্যাগ করেননি তাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়ে পড়ে। এই বিপন্ন মানুষগুলি বিশেষ করে এবং তার সঙ্গে নিম্নশ্রেণির হিন্দুরা উত্তর তুর্কি আক্রমণ পর্বে ইসলামের পতাকা তলে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ফলত বঙ্গভূমিতে বৌদ্ধ সমাজ-সংস্কৃতির অস্তিত্ব প্রায় লোপ পেয়েছিল—'বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলি জনসাধারণের ভাষা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। যে জনপদ (পূর্ববঙ্গ) এক কোটির অধিক বৌদ্ধ এবং ১১৫০০ ভিক্ষু বাস করিত সেখানে একখানি বৌদ্ধগ্রন্থ ত্রিশ বৎসরের চেষ্টায় পাওয়া যায় নাই। যে পূর্ব-ভারত বৌদ্ধধর্মের প্রধান লীলাক্ষেত্র ছিল, তথায় বৌদ্ধধর্মের যে অস্তিত্ব ছিল, তাহাও য়ুরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণের চেষ্টায় অধুনা আবিষ্কার করিতে হইয়াছে।' (দীনেশচন্দ্র সেন, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান) তুর্কি আক্রমণের প্রেক্ষিতে নতুন করে কেউ দেশত্যাগ করেননি। তুর্কি আক্রমণের কারণে চর্যাকাররা তাঁদের সাধের চর্যাপদ নিয়ে নেপালে পালিয়ে যাননি। এই ঘটনা ঘটেছিল তুর্কি আক্রমণের আগেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজা শশাঙ্ক ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর অঞ্চলে বসবাসকারী প্রত্যেক হিন্দুর পবিত্র কর্তব্য বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পুরুষ মাত্রকে বধ করা, কেউ এই দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রকাশ করলে তার মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে—'কথিত আছে কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্কের আদেশ ছিল—সেতুবন্ধ হইতে হিমগিরি পর্যন্ত যত বৌদ্ধ আছে—বালক-বৃদ্ধ-নির্বিশেষে তাহাদিগকে হত্যা করিবে, যে না করিবে তাহার মৃত্যুদণ্ড হইবে।' (দীনেশচন্দ্র সেন, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান)

এ তো গেল একদিকের কথা, এবার অন্যদিকের কথায় আসা যাক। বিতর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় তুর্কি আক্রমণের ফলে বাংলা সাহিত্যের কিছু ক্ষতি হয়েছে তা হলেও মনে রাখতে হবে এই ক্ষতিই শেষকথা নয়, পাশাপাশি লাভও হয়েছে এবং তুলনামূলক বিচারে লাভের অঙ্ক অনেক বেশি। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি প্রধান ধারা বর্তমান— মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, বৈষ্ণবসাহিত্য, রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান, ইসলামি সাহিত্য প্রভৃতি। এই প্রধান ধারাগুলির মধ্যে দুটি ধারা তুর্কি আক্রমণের প্রত্যক্ষ ফসল। তুর্কি আক্রমণ না ঘটলে রসুল চরিত, মর্সীয়া সাহিত্য থেকে শুরু করে বিরাট ইসলামি সাহিত্য ধারার সৃষ্টিই হত না। রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যানের প্রণয়ন ও চর্চা মোটেই সহজ হত না তুর্কি আক্রমণ ব্যতিরেকে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে রোমান্টিক কাব্যের অভাব ছিল না। তাই কেউ কেউ মনে করতে পারেন তুর্কি আক্রমণ না ঘটলেও রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান প্রণীত হত। মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য প্রভৃতিতে ক্ষেত্রে বিশেষে বাঙালি কবিরা যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের অনুসারী হয়েছেন তেমনি সংস্কৃত রোমান্টিক কাব্যের অনুসরণে তাঁরা বাংলায় রোমান্টিক কাব্য-কবিতা রচনা করতেন। এই ধারণা ঠিক নয়। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে দুই ধরনের প্রণয় উপাখ্যান লেখা হয়েছিল—আরবীয় উৎস জাত ও ভারতীয় উৎস জাত। বলার অপেক্ষা রাখে না, তুর্কি আক্রমণের অভিঘাত ব্যতীত পদ্মাবতী, লোরচন্দ্রাণী থেকে শুরু করে মুহম্মদ কবীরের মধুমালতী পর্যন্ত ভারতীয় ধারার যে কাব্যগুলি রচিত হয়েছে সে সবেরই মূলে রয়েছেন মুসলমান কবিরা, অন্যঅর্থে আরবি, ফারসি সাহিত্যের রোমান্টিক কাব্যের ঐতিহ্য। ভারতীয় সাহিত্যে মুসলমান কবিরা আরবি ফারসি সাহিত্যের ঐতিহ্য অনুসারে লোকায়ত

জীবনে প্রচলিত কাহিনিগুলিকে নবরূপে নির্মিতি দিয়েছিলেন। তাঁদের রচিত এইসব কাব্য অনুসরণে রচিত হয়েছিল আলাওলের পদ্মাবতী, দৌলতকাজীর লোরচন্দ্রাণী প্রভৃতি। যদি জায়সীর পদুমাবৎ বা মিয়া সাধনের মৈনা কা সাৎ না রচিত হত তবে লোরচন্দ্রাণী বা পদ্মাবতী রচনা মোটেই সহজ হত না; কালিদাসের মেঘদূত প্রভৃতির উজ্জ্বল উপস্থিতি সত্ত্বেও। অন্যসব প্রতিবন্ধকতা জয় করা গেলেও সমাজ-মানসিক বাধা থেকে উত্তীর্ণ হওয়া বরাবরই অত্যন্ত কঠিন। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে অজস্র রোমান্টিক কাব্য-কবিতা রচিত হয়েছে এবং এই ধারার কবি-সমাজে অমুসলমান কবিরা প্রায় নেই। না থাকাই স্বাভাবিক। সময় তখন বাঙালি হিন্দু সমাজের পক্ষে ছিল না। রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাহারা জাতি সচেষ্ট ছিলেন তাদের হৃত গৌরব ফিরে পেতে। অনেক প্রয়াস সত্ত্বেও বিশেষ সুবিধা হচ্ছিল না। আত্মশক্তির উপর প্রত্যয় করতে না পেরে দেবদেবীদের উপর নির্ভর করা হয়েছিল বিশেষ করে। তারপরেও অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। শত শত বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল হৃত গৌরব পুনরোদ্ধারের স্বপ্ন দেখে। সবমিলিয়ে জাতীয় জীবনের পক্ষে পরিস্থিতিটা সুবিধাজনক ছিল না। এই অবস্থায় রোমান্টিক কাব্য রচিত হওয়া স্বাভাবিক নয়।

মুসলমান সমাজের চিত্রটা তখন অন্যরকম ছিল। সমাজের দুটি প্রধান শ্রেণি— আরব বংশোদ্ভূত এবং এদেশীয়। আরব দেশীয় মুসলমানরা যখন বাংলার মাটিতে রাজনৈতিকভাবে প্রভুত্ব বিস্তার করছিলেন তখন ইসলামের স্বর্ণোজ্জ্বল দিন শেষ হতে চলেছে। যেটুকু আলো তখনও অবশিষ্ট ছিল তাই দিয়ে কিছু একটা করার চেষ্টা করছিলেন সেদিনের রাজন্যবর্গ। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাই বিরাট কিছু ছাপ তাঁরা রাখতে পারছিলেন না। মৌলিক কোনো সাহিত্য রচিত হয়নি এইযুগে। ঐতিহ্যের ভাণ্ডার থেকে যেটুকু রসদ চুঁইয়ে পড়ছিল তাকেই পাথেয় করা হয়েছিল। এই পথে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছিল এমনিতে তা তেমন কিছু না হলেও সমকালীন গতানুগতিক সাহিত্য সংস্কৃতির সাপেক্ষে যথেষ্ট ছিল। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমান কবি সাহিত্যিকরা এই সম্ভাবনার দিকটিকে বিশেষ কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। এতকাল যারা ছিল শুধুই শোষিত, নির্যাতিত শ্রেণির আজ ইসলামের পতাকাতলে এসে তারা কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার সুযোগ পেয়েছেন, উত্তরাধিকার হিসাবে লাভ করেছেন এক বিরাট সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভাণ্ডারকে। এই অবস্থায় জাতীয় জীবনে স্ফূর্তি দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। পদমাবুৎ, মৈনা কা সৎ, চন্দ্রায়ন, মনোহর মধুমালতী প্রভৃতি সেই স্ফূর্তিরই উচ্চকিত উচ্চারণ। একটা প্রশ্ন এক্ষেত্রে থেকে যায়, প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিদের মধ্যে কতজন এদেশীয় আর কতজন আরব বংশোদ্ভূত। প্রশ্নটি অদ্যাবধি অমীমাংসিত রয়েছে। আমরা মনে করি মুসলমান কবিদের অধিকাংশই ছিলেন হয় এদেশীয়, নয় আরবীয় ও ভারতীয় ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ। সেদিন যেসব ধর্ম প্রচারকরা এদেশে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ জন বিয়ে করেছিলেন স্থানীয় মেয়েকে। আর তাঁদেরই উত্তরসূরিদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল বাংলার মুসলমান সমাজের ভিত্তি। সুফি সাধকদের মতো অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল সেনাবাহিনীতে চাকরি নিয়ে এদেশে আসা পুরুষদের ক্ষেত্রেও। তাদের সূত্রেও একপ্রস্থ রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছিল।

রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান, মর্সিয়া সাহিত্য এসব যেমন তুর্কি আক্রমণের প্রত্যক্ষ ফসল, অনুবাদকাব্য, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি তেমন তুর্কি আক্রমণের পরোক্ষ সফল। অনুবাদকাব্যগুলি সৃষ্টি হয়েছিল তুর্কি আক্রমণের ফলে উদ্ভূত সামাজিক প্রেক্ষিতে। বাঙালি হিন্দু সমাজে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ সেদিন চরমে পৌঁছেছিল। নিম্নবর্ণীয় সমাজের পক্ষে সংস্কৃত ভাষাচর্চা, শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ এসব ছিল চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ বিষয়। শাস্ত্রচর্চার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেই সেদিন সমাজপতিরা ক্ষান্ত হননি, দেশীয় ভাষায় অনুবাদের সূত্রেও যাতে নিম্নশ্রেণি শাস্ত্রকথার সঙ্গে পরিচিত না হতে পারে তারও সুব্যবস্থা করা হয়েছিল। উচ্চারণ করা হয়েছিল কঠোর নিষেধাত্মক বাণী—'অষ্টাদশ পুরণানি রামস্য চরিতানি চ/ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবৎ নরকং ব্রজেৎ।' এমন নিষেধের প্রাচীর ডিঙিয়ে অনুবাদ কাব্য রচনা সম্ভব হত না যদি না তুর্কি আক্রমণ ঘটত। তুর্কি আক্রমণের প্রাবল্যে ভেসে যায় সমাজে উচ্চ নীচ ভেদাভেদের বেড়াজাল। বিদেশীয়, বিজাতীয় শাসক ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে আলাদা করে দেখেননি, সকলকে টেনে এনে একাসনে বসিয়েছিলেন। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সেদিন ব্রাহ্মণ্য শ্রেণির পক্ষে তাদের নিম্নশ্রেণির ভাইদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। বহুকালাবধি শোষিত নির্যাতিত হওয়ার পর মুক্তির দিশা পাওয়াতে সাধারণ মানুষ দলে দলে স্বধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিচ্ছিলেন। নাভিশ্বাস দেখা দিয়েছিল সমাজপতিদের। ব্রাহ্মণ্য শ্রেণি আজও সংখ্যায় স্বল্প, সেদিন আরও স্বল্প ছিলেন। সমাজের অধিকাংশই যদি ধর্ম ত্যাগ করেন তবে মুষ্টিমেয়ের পক্ষে স্বধর্মে অধিষ্ঠিত থাকা কঠিনতর হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় সমাজপতিরা উদ্যোগী হন ধর্মত্যাগ রদ করার জন্য। তাঁদের এই কাজে প্রধান বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সাধারণ হিন্দু সমাজের অজ্ঞতা। ধর্ম সম্পর্কে ন্যূনতম বৌদ্ধিক জ্ঞান এদের ছিল না। থাকবে কী করে। ধর্মচর্চার সম্ভাব্য সব পথেই যে সমাজপতিরা কাঁটা বিছিয়ে রেখেছিলেন। নিম্ন সমাজের হিন্দুরা সেদিন আক্ষরিক অর্থেই নামে মাত্র হিন্দু ছিলেন। হিন্দু সমাজেরও যে কিছু ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্যের দিক রয়েছে এ বিষয়ে তারা কিছুমাত্র সচেতন ছিলেন না। এমন অবস্থায় ধর্মের সঙ্গে ব্যক্তিমনের কোনো আত্মীয়তা তৈরি হয় না। হিন্দু সমাজেও তা হয়নি। অবলীলায় লোকে ধর্মত্যাগ করছিলেন। পরিস্থিতির পাঠ নিয়ে সমাজপতিরা সিদ্ধান্ত করেন, যদি এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হয় তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিজস্ব ধর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে হবে, হিন্দুধর্মের ঐতিহ্য সম্পর্কে তাদের সচেতন করতে হবে। আর একাজ করতে হলে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা একান্ত জরুরি। কেননা শাস্ত্রগ্রন্থগুলির সবই সংস্কৃত ভাষায় লেখা। এই কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। একটা গোটা সমাজকে রাতারাতি সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী করে শাস্ত্রপাঠের উপযোগী করে তোলা ছিল এককথায় অসম্ভব। ফলত বিকল্প পথ অবলম্বন করা হয়েছিল। দ্রুত সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থসমূহকে দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন কবি-সাহিত্যিকরা। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত সবই অনুবাদ করা হয়েছিল। সামাজিক প্রেক্ষিতের পাশাপাশি অনুবাদকাব্য রচনার মূলে অনুঘটক হিসাবে

কাজ করেছিল আরও একটি বিষয়। বিদেশি শাসকের পক্ষে কোনো দেশ স্থায়ীভাবে শাসন করতে হলে সেদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা আবশ্যিক। মুসলমান শাসকরা তাই বিশেষ রূপে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কবি সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন দেশীয় ভাষায় কাব্যচর্চা করার জন্য। কৃত্তিবাস থেকে শুরু করে অনুবাদ কাব্যধারার প্রায় সকল প্রধান কবিই কমবেশি রাজসভার আনুকূল্য পেয়েছিলেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, তুর্কি আক্রমণের ঘটনা না ঘটলে অনুবাদ কাব্য রচনা হত না, অথবা বহু বিলম্বে রচিত হত।

তুর্কি আক্রমণের ফলে উদ্ভূত সামাজিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে একদিকে যেমন অনুবাদ কাব্য রচনা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল অন্যদিকে তেমনি প্রশস্ত হয়েছিল মঙ্গলকাব্যের পটভূমি। অনুবাদ কাব্যের মধ্য দিয়ে কেবল হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য কথা শুনিয়ে সাধারণের আস্থা অর্জন করা সম্ভব ছিল না। সংশয়ের বা অবিশ্বাসের মূল প্রবিষ্ট হয়েছিল গভীর থেকে গভীরে। এই অবস্থায় পারস্পরিক বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার জন্য উচ্চসমাজের পক্ষ থেকে আরও কিছু করার দরকার ছিল এবং তারা যথাসাধ্য করেছিলেন। মঙ্গলকাব্যগুলি সেই প্রচেষ্টার ফসল। প্রাক্ তুর্কি আক্রমণ পর্বে উচ্চ ও নিম্নবর্ণীয় হিন্দু সমাজ হিন্দু মাত্র ছিলেন। দুটি শ্রেণির মধ্যে আচরণীয় ধর্মে ছিল বিস্তর ব্যবধান। উচ্চসমাজে যেসব দেবদেবী ও পূজার্চনার প্রচলন ছিল নিম্ন সমাজের তাতে কোনো অধিকার ছিল না। তারা তাদের মতো করে নিজস্ব কিছু দেবদেবীর ধারণা পোষণ করতেন এবং পূজার্চনা সহযোগে তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করতেন। উচ্চসমাজ অনুভব করলেন আচরণের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথের পথিক এই নিম্ন সমাজকে যদি রক্ষা করতে হয়, অর্জন করতে হয় তাদের বিশ্বাস ও আস্থা তবে তাদের সঙ্গে এখন আত্মীয়তার সম্পর্ক রচনা করা আবশ্যক। এই আত্মীয়তা স্থাপনের তাগিদ থেকে সম্পাদিত হয়েছিল এক অলিখিত সামাজিক চুক্তি। চুক্তির শর্ত অনুসারে উচ্চসমাজে প্রচলিত দেবতার উপর নিম্ন সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নিম্ন সমাজে প্রচলিত দেবদেবীকে আসন করে দেওয়া হয় উচ্চসমাজে। উচ্চসমাজ সানন্দে ওইসব দেবদেবীর মহিমা কীর্তন করা শুরু করেন।

এসব করতে গেলে আরও একটা কিছু করতে হয়। আমাদের সামাজিক জীবনে যেমন ছেলে মেয়েদের মধ্যে বিয়ে দিয়ে আত্মীয়তার সম্পর্ককে দৃঢ় করা হয় এখানেও তেমনি করা হল। অনার্য সমাজের দেবতা মনসাকে শিবের কন্যা ও চণ্ডীকে শিবের স্ত্রীর পোশাক পরিয়ে উচ্চসমাজে পরিবেশন করার বিষয়ে সহমত হলেন সমাজপতিরা। কোনো বিষয়ের পরিকল্পনা করা ও তার রূপায়ণের মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকে। এখানেও তার ব্যতিক্রম হল না। ব্রাহ্মণ্য শ্রেণি নিজস্ব স্বার্থে মনসাকে তাদের সমাজে স্থান করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যে ক্রাইসিস থেকে তারা মনসাকে উচ্চসমাজে স্থান দিয়েছিলেন বৈশ্যদের দিক থেকে সেই ক্রাইসিস ছিল না। ফলত বৈশ্য শিরোমণি চাঁদসদাগর মেনে নিতে চায়নি বিষয়টি, ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করেছিল দেবী মনসাকে। তবে স্রোতের বিরুদ্ধে গিয়ে চাঁদ বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি, পরিস্থিতির চাপ ও যুগের দাবির কাছে তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। অতঃপর আর কোনো গোলযোগ হয়নি। শিবের পত্নী হিসাবে চণ্ডীকে মেনে নেওয়া হয়েছিল সমাজের সব পক্ষ থেকে। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ মুকুন্দ চক্রবর্তী দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্তনমূলক কাব্য রচনা করে নন্দিত হয়েছিলেন সমাজের সকল শ্রেণির দ্বারা। তারপর কালের স্রোতে একটা সময় পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। ততদিনে রঙ্গমঞ্চে পদার্পণ করেছেন চৈতন্যদেব। তথাকথিত সমাজপতিরা অনেক দিনের অনেক চেষ্টায় যা করে উঠতে পারেননি চৈতন্যদেব এককভাবে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে তা সম্পন্ন করলেন। উচ্চ ও নিম্নশ্রেণির মধ্যে সেতুবন্ধন হল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন ব্রাহ্মণ্য শ্রেণি। তবে ওই নিশ্বাস ফেলা মাত্র। নিম্নশ্রেণিকে এই যে দায়ে পড়ে তোয়াজ করা তা তারা বেশিদিন বরদাস্ত করতে পারলেন না, পরিস্থিতি একটু অনুকূল হতেই আবার তারা স্বমূর্তি ধারণ করলেন। মহাপ্রভুকে রঙ্গমঞ্চ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল প্রথমেই। সম্ভবত পুরির মন্দির গাত্রে গেঁথে দেওয়া হয় তাঁকে। অতঃপর নতুন করে শুরু হল নিম্নশ্রেণিকে ব্রাত্য করে রাখার খেলা। এই খেলার সূত্রে উচ্চশ্রেণিতে শেষপর্যন্ত কলকে পেলেন না ধর্মঠাকুর। ঘটনার পরিণতি যাই হোক এর মূলে যে তুর্কি আক্রমণের অভিঘাত রয়েছে তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মঙ্গলকাব্যগুলিকে বলা হয় বাংলার নবপুরাণ। এই অভিধা যথার্থ। কয়েক সহস্র বছর পূর্বে ভারতেতিহাসে আর্য-অনার্য সমাজের যে দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের প্রেক্ষিতে রচিত হয়েছিল সংস্কৃত পুরাণ গ্রন্থগুলি অনুরূপ দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের প্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে বাংলা মঙ্গলকাব্য সমূহ।

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ধারা বৈষ্ণব সাহিত্য। অপরাপর ধারাগুলির মতো তুর্কি আক্রমণের সঙ্গে বৈষ্ণবসাহিত্যের প্রত্যক্ষ কোনো সংযোগ নেই। তবে বৈষ্ণবসাহিত্যের সমৃদ্ধির নেপথ্যে তুর্কি আক্রমণের বড় ভূমিকা রয়েছে। বৈষ্ণব ধর্মের দুটি প্রধান ধারা— ভারতীয় বৈষ্ণবধর্ম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম। ভারতীয় বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শনের এক মূলগত পার্থক্য বর্তমান। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূলকথা অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব। বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্য দাঁড়িয়ে রয়েছে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের উপর ভর করে। ভক্তিযোগ এখানে শেষ কথা। বাংলা বৈষ্ণবসাহিত্যের অন্যঅর্থে গৌড়ীয় তত্ত্বদর্শনের মূলসুর যে ভক্তিবাদ তার মূলে রয়েছে ইসলামি সংস্কৃতি। ইসলামে ধর্মসাধনার দুটি প্রধান ধারা বর্তমান— শাস্ত্রীয় আচারনিষ্ঠ ধর্মমত ও সুফিবাদ। সুফি মতাবলম্বীরা নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত প্রভৃতি শাস্ত্র নির্দেশিত পথে পরিক্রমণ করেন না। ঈশ্বর বা আল্লা তাঁদের চোখে কোনো ঐশ্বর্যময় পুরুষ নন। আল্লাহ পরম প্রেমময়। প্রেমভাব সহযোগে তাঁরা ঈশ্বরের আরাধনা করেন। মাসুক (ভক্ত) রূপে আসেক (ঈশ্বর)কে পেতে চান তাঁরা। বিষয়টি গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বদর্শনের অনুরূপ। প্রাক্ চৈতন্যযুগে ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্ম যেরূপে প্রচলিত ছিল কৃষ্ণ সেখানে ঐশ্বর্যময় পুরুষ। প্রেমভাবে তাঁকে কামনা করার কোনো প্রশ্নই আসে না। চৈতন্যদেবই প্রথম কৃষ্ণ সম্পর্কিত এই প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন ঘটান, কৃষ্ণভাবনায় নতুনমাত্রা আরোপ করেন তিনি। প্রশ্ন হল, এই নতুন ভাবনার উৎস কী। মহাপ্রভু কোথা থেকে এ বস্তু আয়ত্ত করলেন। এখানেই উঠে আসে তুর্কি আক্রমণের অনুষঙ্গ। রাজন্যশক্তির পিছনে পিছনে বাংলাদেশে এসেছিল সুফি সাধক সম্প্রদায়।

ক্রমে ক্রমে সমগ্র বঙ্গদেশজুড়ে তাঁদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলার মাটিতে মুসলমানদের যে এই সংখ্যাধিক্য তার মূলে সুফি সাধকদের ভূমিকাই প্রধান। সুফি সাধকদের অনন্য মোহিনিশক্তি ও তাঁদের ধর্মভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকবেন মহাপ্রভু। এমন সম্ভাবনার কথা উচ্চারণ করেছেন প্রাজ্ঞজনেরা। তাই যদি হয় তবে বৈষ্ণব সাহিত্যের উপর, আরও ব্যাখ্যা করে বললে বলতে হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্যের উপর তুর্কি আক্রমণের প্রভাব অনস্বীকার্য। কেউ কেউ মনে করেন, যে সুফিতত্ত্বের দ্বারা মহাপ্রভু প্রভাবিত হয়েছিলেন সেই সুফি ধর্মভাবনা মুসলমানদের বা আরব বিশ্বের কোনো মৌলিক ভাবনার ফসল নয়। বৌদ্ধ ভারতবর্ষ থেকে প্রথম এই ভাবনা উৎসারিত হয়েছিল। আরবরা ভারতীয়দের ভাবনাকেই আত্তীকরণ করেন এবং পরে নতুন সাজে সজ্জিত করে তা ভারতবাসীকেই ফিরিয়ে দেন। বিষয়টি নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। আমরা সে বিতর্কের জালে জড়াতে চাই না। আমরা বরং একটা কথা স্পষ্ট করে বলতে পারি, সুফি ভাবনার উৎসভূমি যদি ভারতবর্ষ হয় তবে তার পরেও এক্ষেত্রে তুর্কি আক্রমণের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। কেননা আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন সুফিভাবনা ভারতভূমি থেকে সম্পূর্ণ অপসৃত হয়েছিল। গোটা দেশজুড়ে যাগযজ্ঞ নির্ভর ধর্মের মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। ইসলামের আগমন না হলে, বাংলায় তুর্কি অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে সুফিতত্ত্বকে তার বর্তমান রূপে চিনে নেওয়া ও একে আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব ছিল না। এই সম্ভাবনার পথ প্রস্তুত করার সূত্রেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে তুর্কি আক্রমণের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। তুর্কি আক্রমণের ফলে বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্য পরোক্ষ প্রভাবের পাশাপাশি প্রত্যক্ষ ভাবেও বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিল। শতাধিক মুসলমান কবি রচনা করেছিলেন শত সহস্র বৈষ্ণব পদ। যা ছিল শুধুই একটা সম্প্রদায় মাত্রের ধর্মীয় সাহিত্য তা সর্বজনীন নির্মিতি পায় এই সূত্রে। মুসলমান কবিদের রচিত বৈষ্ণব পদের সংখ্যা যেমন যথেষ্ট তেমনি কোনো কোনো পদের কাব্যমূল্যও অসামান্য। বলাবাহুল্য বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি, বিশেষত পদাবলী রচনায় মুসলমান কবিদের যে কৃতিত্ব তার সম্ভাবনা মাত্র দানা বাঁধত না যদি না তুর্কি আক্রমণ ঘটত।

কথায় কথায় অনেক দূর এগিয়ে আসা হল। আর দুটি মাত্র প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আমরা আমাদের কথা শেষ করবো। আমরা জানি বাংলাভাষা এখনও একটি গঠনশীল বিষয়। যে কোনো ভাষা ও সাহিত্যর সংগঠন তখনই দৃঢ় হয় যখন অন্য কোনো সংস্কৃতির সঙ্গে এর সংযোগ ও সমন্বয় ঘটে। তুর্কিরা যখন বাংলার মাটিতে পা রেখেছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের তখন নিতান্ত হাঁটি হাঁটি পা পা অবস্থা। এই অবস্থায় তুর্কি আক্রমণের ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশেষভাবে লাভবান হয়েছিল। তুর্কিরা সঙ্গে করে এনেছিলেন আরবি এবং ফারসির মতো সুমহান দুই ভাষা এবং সংস্কৃতিকে। আরবি ফারসি সাহিত্যের ঝরনা ধারায় সেদিনের বাংলা সাহিত্য যেমন বিশেষরূপে স্নাত হয়েছিল তেমনি সমৃদ্ধ হয়েছিল বাংলা ভাষাও। একটা সময় পর্যন্ত বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের বিরাট অংশ জুড়ে ছিল আরবি ফারসি শব্দ। বর্তমানে নানা আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কারণে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। তবু আজও বাংলা ভাষায় আরবি ফারসি শব্দের সংখ্যা সামান্য নয়। বাংলা ভাষায় এমন হাজারও আরবি ফারসি শব্দ প্রচলিত রয়েছে যার কোনো প্রতিশব্দ অদ্যাবধি প্রচলিত হয়নি। যদি তুর্কি আক্রমণ না ঘটত তবে বাংলা ভাষার আজকের এই সমৃদ্ধ রূপ আমরা দেখতে পেতাম কি? ঘোর সন্দেহের অবকাশ আছে। অগ্রগতির পথে অন্তত কয়েক শত বছর পিছিয়ে থাকতাম আমরা।

শেষের কথাটি হল এই। তুর্কি আক্রমণের অব্যবহিত পরবর্তী যে কালপর্বকে অন্ধকার যুগ বলা হচ্ছে সেই কালপর্বে বাংলার বাইরে, যেখানে তুর্কি আক্রমণের প্রভাব পড়েনি সেখানে অপরাপর দেশীয় ভাষায় কী লেখা হয়েছে তা খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে এই পর্বে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো সৃষ্টি নেই। পাশাপাশি আরও একটি সত্য এক্ষেত্রে উঁকি দেয়। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের অপরাপর অঞ্চলে তো বটেই এই বঙ্গদেশেও সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় সাহিত্যচর্চা হয়েছিল। বাংলাদেশে চর্চিত সাহিত্য সমূহের মধ্যে প্রাকৃতপৈঙ্গল, সুদুক্তিকর্ণামৃত, সেখশুভোদয়া, চতুরাভরণ, উমাপতিধরের রাজপ্রশস্তি, সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা টীপ্পনি প্রভৃতির নাম করা যায়। তাই যদি হয় তবে তুর্কি আক্রমণের ফলে সাহিত্যচর্চা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কবি সাহিত্যিকরা কলম বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন এমন বক্তব্য ধোপে টেকে কি? তুর্কি আক্রমণের ফলে যদি ক্ষতি হয় তবে তা সংস্কৃত ভাষার ক্ষেত্রে বেশি করে হবে। কেননা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সমাজ রাজসভা বা রাজতন্ত্রের কাছাকাছি অবস্থান করতেন। গ্রামে গঞ্জে যেখানে বাংলা ভাষার চর্চা হওয়ার সুযোগ ছিল সেখানে সহসা রাজন্যবর্গের দৃষ্টি প্রসারিত না হওয়াই স্বাভাবিক। এদিকে সংস্কৃত ভাষার চর্চা হল আর বাংলা ভাষার চর্চা চলল না এটা কী করে হয়। আমরা বিশ্বাস করি, ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলাসাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়নি মানে এমন নয় এইযুগে সাহিত্যচর্চা হয়নি। সাহিত্যচর্চার একটা পরম্পরা না থাকলে চর্যাপদ থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আসা যায় না। তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া হয় এইসময় সাহিত্যচর্চা হয়নি, তবে তার কারণ তুর্কি আক্রমণ নয়। সমাজ-ভাষিক কারণেই সেদিন সাহিত্যচর্চার ধারা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। একটা যুগের অবসান ও নতুন একটা যুগের সূত্রপাত হচ্ছিল। অর্থাৎ সময়টা ছিল যুগসন্ধির। এমন সময়ে সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চায় স্বাভাবিক কারণে ভাঁটার টান চলে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাই হয়ে থাকবে। তুর্কি আক্রমণের সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ কোনো যোগ নেই। দুই এর মধ্যে সেতুবন্ধন করার চেষ্টা একটা অসত্যকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার অশোভন পণ্ডিতি প্রয়াস মাত্র।